কার্টুনিস্ট কুট্টির মূর্তিচর্চা

কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত

অজস্র ব্যক্তিত্বের স্ট্যাচু সম্বলিত কলকাতা শহরকে অনায়াসেই বলা যায় মূর্তির শহর। বাঙালি, অবাঙালি এমনকি অভারতীয়রাও ঠাঁই পেয়েছেন কলকাতার মূর্তি-মিছিলে। গুণগত মাণের দিক থেকে সব মূর্তিগুলিই খুব উঁচুদরের না হলেও বেশ কিছু ভালো কাজ কলকাতার রাজপথকে অলঙ্কৃত করেছে, এদেশের শিল্পচর্চাকে করেছে গৌরবান্বিত। যদিও কলকাতার পথভাস্কর্য নিয়ে আলাদাভাবে খুব বেশি আলোচনা হতে দেখা যায় না, তবু তারই মধ্যে কতিপয় মানুষ বিরল ব্যতিক্রমী হয়ে কৌতুহল প্রকাশ করেছেন এ বিষয়ে। এ-যুগের বিখ্যাত কার্টুনিস্ট পি. কে. এস. কুট্টি নব্বই-এর দশকের প্রথমভাগে কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত স্মরণীয় মানুষের মুর্তিগুলি দেখে একটি অসামান্য সিরিজ রচনা করেছিলেন। কুট্টির স্বভাবসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল সেই কাজে। কুট্টি তখন *আজকাল* পত্রিকায় নিয়মিত কার্টুন আঁকেন। মূলত রাজনৈতিক কার্টুনের জন্যই তাঁর খ্যাতি। তবু কুট্টিকে নিজের ক্ষেত্র থেকে একটুখানি বিচ্যুত করে যে মানুষটি তাঁকে দিয়ে এই আশ্চর্য সিরিজটি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি হলেন আর এক কিংবদন্তি শিল্পপ্রাণ মানুষ পূর্ণেন্দু পত্রী। কুট্টির আঁকা এই চিত্রমালা ‘মূর্তি দেখে কুট্টি’ (Kutty Views Calcutta Statues) শিরোনামে যখন বই আকারে (প্রকাশক : আজকাল) প্রকাশিত হয় তখন তার জন্য একটি অনবদ্য ভূমিকাও (‘ভেলকির ইতিকথা’) লিখেছিলেন পূর্ণেন্দু। সেই ভূমিকার মধ্যে ধরা রয়েছে কুট্টির এই সিরিজ রচনার নেপথ্য কাহিনি। প্রথমে কুট্টিকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কলকাতা শহরকে

নিয়ে একটি কার্টুন সিরিজ আঁকার। কলকাতার নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে পছন্দসই বিষয় নির্বাচন করে কুট্টি আঁকবেন ছবি, যার মধ্যে ফুটে উঠবে কলকাতার নিজস্ব মাহাত্ম্য, শঠতা, ঔদার্য, বোকামি – এক কথায় তার সমস্ত প্রাণস্পন্দন। কিন্তু কুট্টি কিছুতেই রাজি হলেন না। তাঁর পছন্দের বিষয় কেবল মানুষ, ব্যক্তিবিহীন চিত্রকল্পে কুট্টির আগ্রহ নেই কোনও। সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পীকে বিকল্প প্রস্তাব – তাহলে কলকাতার বিখ্যাত স্ট্যাচুগুলিকে বিষয় করে তিনি কাজ করুন। কুট্টি পলকে রাজি। কালবিলম্ব না করে কুট্টি কাজ শুরু করেদিলেন পরের দিন থেকেই। একটি গাড়ি বরাদ্দ হল তাঁর জন্য। সেই গাড়িতে চেপে পরপর তিনদিন ধরে তিনি চষে ফেললেন কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত। চটজলদি স্কেচ করলেন, নোটও নিলেন কিছু। তারপর সে-সব বাক্সবন্দি করে ফিরে গেলেন দিল্লি। তারপর? পূর্ণেন্দু পত্রী 'মূর্তি দেখে কুট্টি'-র ভূমিকায় লিখছেন ''ক'দিন পরে সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে আসতে লাগল ছবির তোড়া। খুলি, দেখি আর অবাক হই। আরও অবাক হই, প্রত্যেকটি ছবির সঙ্গে তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে। পাক্কা সমালোচকের চোখ, আর শিল্পীর মন। কী নিখুঁত পর্যবেক্ষণ। আর কী বিস্ময়কর সব উদ্ঘাটন। কলকাতা আমাদের কত পরিচিত। অথচ সেও যে কতখানি অজানা, চিনিয়ে দিলেন তিনি। কত অসঙ্গতির দিকেই না তাঁর অঙ্গুলিনির্দেশ।'' বাস্তবিকই একজন কার্টুনিস্টের চেয়ে বড়ো সমালোচক আর কেই বা আছেন এই দুনিয়ায়? মানুষের চরিত্র ও তার যাবতীয় প্রবণতার সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যবেক্ষক হলেন একজন কার্টুনিস্ট। কাজেই ভাস্করের শিল্পকর্মে কতটা প্রাণ পেয়েছে প্রস্ফুটিত মানুষটির ব্যক্তিত্ব তা বোঝার জন্য কুট্টির মতো শিল্পীই তো আদর্শ। আমরা যারা কুট্টির কাজের ভক্তদর্শক তারা জানি তিনি কত অল্পরেখার উপাচারে মনুষ্যমূর্তি অঙ্কণে দক্ষ ছিলেন। জীবন্ত মানুষকে নিয়ে যে শিল্পীর কারবার সেই শিল্পী যখন মূর্তি কিংবা ভাস্কর্য দেখে রচনা করেন কার্টুন, তখন রচিত হয় এক আলাদা রকমের নান্দনিকতা। সে নান্দনিকতায় সমালোচনা ও পুনর্সৃষ্টি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে

কুইনস্ ওয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হৃষিকেশ দাশগুপ্তর তৈরি শ্রীঅরবিন্দের মূর্তি দেখে কী অসামান্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় কুট্টি তাকে তুলনা করলেন একটি ছাগমূর্তির সঙ্গে। অনেকে হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন তাঁর এই তুলনায়, কিন্তু মনে রাখতে হবে শিল্পী এখানে মতামত দিচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দের মূর্তিটি বিষয়ে, ব্যক্তি অরবিন্দ বিষয়ে নয়। এই কথাটুকু মাথায় রেখেই আমাদের দেখতে হবে কুট্টির বাকি মূল্যায়ণগুলিকে। যেখানে কখনও তিনি রাজভবনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্থাপিত নেতাজির বিখ্যাত ভাস্কর্যটি সম্পর্কে বলছেন, ‘ ... নেতাজির গা থেকে ট্রেথড কোটটা ছুঁড়ে ফেলুন। দেখবেন, ভাল দেখাবে।’ অথবা আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে স্থাপিত সেলিম মুন্সির তৈরি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কুট্টির কৌতুক – এ রবীন্দ্রনাথ যেন শীতের কোট পরা কোনও মহিলা। কবির সঙ্গে এতটাই বৈসাদৃশ্য তার। কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর্য দেখে শুধু কি নিন্দেই করে গেছেন কুট্টি? তা কিন্তু নয়। বরং যেখানে যে কাজকে ভালো বলে মনে হয়েছে তাঁর, মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। লিখিত মন্তব্যের পাশাপাশি ছবি এঁকে বুঝিয়েও দিয়েছেন সুস্পষ্টভাবে কোথায় সে ভাস্কর্যের অনন্যত। যেমন রমেশ পালের গড়া মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তিটি প্রসঙ্গে, কী সুন্দর রেখার বন্ধনে কুট্টি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মূর্তিটির দৃপ্ততার কথা। উল্লেখ্য এই যে রাণি ভিক্টোরিয়ার স্ট্যাচুটিকে বাদ দিলে কলকাতার বুকে এটিই প্রথম কোনও মহিলার মূর্তি। ১৯৭৭ সালে রেড রোড ও নানক রোডের

সংযোগস্থলে এই মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। উৎকৃষ্ট কাজের জন্য কুট্টি স্বীকৃতি দিয়েছেন মারাঠা ভাস্কর জি. এম. কোলহাতকরের তৈরি বাল গঙ্গাধর তিলককে, কার্তিকচন্দ্র পালের তৈরি রাসবিহারী বসুকে, রাশিয়ান ভাস্কর ভ্যাসিলিয়েভিচ তমসকির তৈরি লেনিন মূর্তিকে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকৃত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে অথবা তাপস দত্তের তৈরি ক্ষুদিরাম বসুকে। কেন এবং কীসের জন্য এইসব কাজগুলি অনন্য সেটি কুট্টি বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর অনবদ্য রেখার প্রয়োগে। মূর্তিপ্রেমী সাধারণ দর্শক থেকে শিল্পকলার শিক্ষার্থীরা সকলেই যদি মূলমূর্তিগুলির সামনে দাঁড়িয়ে কুট্টির এইসব কার্টুনগুলিকে দেখেন তাহলে তিনি লাভ করবেন এক অনন্য শিল্পপাঠ। পৃথিবীতে আর কোনও ব্যঙ্গচিত্রী এভাবে কোনও একটি শহরের পঞ্চাশটিরও বেশি মূর্তি নিয়ে এরকম কোনও আলেখ্য রচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। 'মূর্তি দেখে কুট্টি' একজন শিল্পীর একক প্রচেষ্টায় রচিত একটি ঐতিহাসিক কীর্তি, যে কীর্তিকে টুপি খুলে স্যালুট করা ছাড়া আমাদের আর কোনও গতি নেই।